Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 05 April 2015 09:32 - Last Updated Monday, 06 April 2015 08:51

[illegible]

নামায-রোযা,হজ-যাকাতে যেমন ফরজ,ওয়াজেব ও সুন্নত আছে,তেমনি ফরজ,ওয়াজেব ও সুন্নত আছে রাজনীতিতেও। আছে বহু হারাম বিষয়ও। অন্যদের কাছে রাজনীতি ক্ষমতাদখলের হাতিয়ার। ফলে সে রাজনীতিতে যেমন মিথ্যাচার ও ভন্ডামী আছে,তেমনি সন্ত্রাস ও ভোটডাকাতিও আছে। আছে শত্রু দেশকে নিজ দেশের অভ্যন্তরে ডেকে আনার ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশে সেটি যেমন একাত্তরে ঘটেছে,তেমনি আজও হচ্ছে। কিন্তু ঈমানদারের কাছে রাজনীতি হলো ব্যক্তি,সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলামিকরণের ইবাদত। তাই এটি পবিত্র জিহাদ। এ জিহাদে যেমন অর্থ,শ্রম,সময় ও মেধার বিনিয়োগ আছে,তেমনি রক্তের বিনিয়োগও আছে। প্রতি পেশা,প্রতি কর্ম ও প্রতি আচরনে পথ দেখায় পবিত্র কোরআন। কিন্তু বেঈমানেরা সে পথে চলতে রাজি নয়। দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি,অর্থনীতি,আদালত,প্রশাসন,পুলিশ ও সেনাদফতরের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশাবলির প্রবেশাধিকার দিতেও রাজি নয়। অথচ মু'মিনের ঈমানদারি হলো,ইসলামের প্রতিটি বিধান মেনে চলায়। তাই শুধু নামায-রোযা,হজ-যাকাতে ফরজ-ওয়াজেব মানলে চলে না,ফরজ-ওয়াজেবগুলি মানতে হয় রাজনীতিতেও।

মাত্র একটি হুকুম অমান্য করায় অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয় এককালে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা ইবলিস। তাই রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গণে মহান আল্লাহতায়ালা কোন একটি হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটলে নামাযী মুসলমানও তখন ঘৃন্য শয়তান বা মুনাফিকে পরিণত হয়। ঈমানদার ব্যক্তির জীবনে প্রতিক্ষণের ভাবনা তাই প্রতিপদে প্রদর্শিত

পথ অনুসরণে —সেটি রাজনীতিতে হোক বা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আইন-আদালতে হোক। প্রদর্শিত সে পথটি হলো সিরাতুল মোস্তাকীম। এখানে অবাধ্য বা বিদ্রোহী হলে ঈমান থাকে না। অন্য কোন সফলতাই এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামে পৌঁছা থেকে বাঁচাতে পারে না। ঈমানদারের জীবনে প্রতি মুহুর্তেই পরীক্ষা। জান্নাতপ্রাপ্তি ঘটে সে পরীক্ষায় পাশের মধ্য দিয়ে। মহান আল্লাহতায়ালার সে ঘোষণাটি এসেছে এভাবে,“মানুষ কি ভেবে নিয়েছে যে ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং পরীক্ষা করা হবে না? আমরা তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও অবশ্যই পরীক্ষা করেছি এবং জেনে নিয়েছি ঈমানের দাবিতে কারা সাচ্চা এবং কারা মিথ্যাবাদী।” –(সুরা আনকাবুত, আয়াত ২-৩)। জীবনের বড় পরীক্ষাটি হয় রাজনীতিতে। এখানে ধরা পড়ে সে কোন পক্ষে দাঁড়ালো,ভোট দিল বা অস্ত্র ধরলো। বাঙালী মুসলমানের জীবনে একাত্তর এসেছিল তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পর্ব নিয়ে। কিন্তু সে পরীক্ষায় বাঙালী মুসলমানগণ কতটা সফল হয়েছিল?

বাঙালী মুসলমানের একাত্তরের পাকিস্তান ভাঙ্গার যুদ্ধজয়টি দেশে-বিদেশের জাতিয়তাবাদী,সমাজবাদী,সাম্রাজ্যবাদী,মুর্তিপূজারি,গো-পূজারি,ইহুদী-খৃষ্টান ও নাস্তিকদের কাছে অতি প্রশংসিত। প্রতিবছর সে বিজয় নিয়ে বাংলাদেশে যেমন উৎসব হয়,তেমনি উৎসব হয় ভারতেও। এই একটি মাত্র উৎসবই কাফেরদের সাথে তারা একত্রে করে। প্রশ্ন হলো,মহান আল্লাহতায়ালার কাছেও কি বাঙালী মুসলমানের কর্মটি শ্রেষ্ঠ কর্ম রূপে বিবেচিত হবে? একাত্তর নিয়ে বহু বই লেখা হয়েছে,বহু আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু একাত্তরের সে পরীক্ষাপর্বে মহান আল্লাহতায়ালার বিধান কতটুকু মানা হয়েছে সে বিচার কি কখনো হয়েছে? তা নিয়ে লেখা হয়েছে কি কোন বই? অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সে বিচার অবশ্যই বসবে। মুসলমানকে সেদিন শুধু নামায-রোযার হিসাব দিলেই চলবে না,রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহে তার নিজস্ব ভূমিকারও হিসাব দিতে হবে। কারণ,মহান আল্লাহতায়ালার কাছে রাজনীতির গুরুত্বটি অপরিসীম। জীবন ও জগত নিয়ে ব্যক্তির ধ্যান-ধারনাগুলি কীরূপ এবং আসলে সে কোন পক্ষের লাঠিয়াল সেটি জায়নামাজে প্রকাশ পায় না,প্রকাশ পায় রাজনীতিতে। মহান আল্লাহতায়ালার শরিয়তি বিধানের প্রতি সে কতটা অনুগত বা বিদ্রোহী সেটিরও প্রকাশ ঘটে রাজনীতিতে। তাই রাজনীতির বিজয়ী পক্ষই নির্ধারণ করে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি,রাষ্ট্রীয় নীতি,অর্থনীতি,আইন-আদালত কোন দিকে পরিচালিত হবে। রাজনীতিই নিয়ন্ত্রণ আনে ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উপর। মহান রাব্বুল আ’লামীন তাই মানব জাতির এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীরব থাকেন কীরূপে? তাই তাঁর যুদ্ধটি স্রেফ মুর্তিপূজারি,অগ্নিপূজারি,দেবে-দেবীপূজারি বা নাস্তিকদের বিরুদ্ধে নয়,বরং ফিরাউন-নমরুদদের ন্যায় রাজনীতির কর্ণধারদের বিরুদ্ধেও। নিজেদের এবং সেসাথে অন্যদের জীবনকে যারা সিরাতুল মোস্তাকীমে পরিচালিত করতে চায়,রাজনীতির নিয়ন্ত্রনকে স্বহস্তে নেয়া ছাড়া তাদের সামনে তাই কোন বিকল্প পথ নেই। খোদ নবীজী (সাঃ)ও তাঁর মহান খলিফাদের এ জন্যই রাষ্ট্রনায়কের আসনে বসতে হয়েছে। রাষ্ট্রের ড্রাইভিং সিটে বসা ও নেতৃত্বের দায়ভার স্বহস্তে নেয়া তাই নবীজী (সাঃ)র মহান সূন্নত। ইসলামের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় এ সূন্নত পালনের মধ্য দিয়ে। মহান নবীজী (সাঃ)র সাহাবাদের জানমালের বেশীর ভাগ ব্যয় হয়েছে সে সূন্নত পালনে। ইসলামে এটি পবিত্রতম জিহাদ। রাজনীতির ময়দানে ঈমানদার ব্যক্তি তাই নীরব দর্শক নয়,তার অবস্থান বরং প্রথম সারিতে।

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 05 April 2015 09:32 - Last Updated Monday, 06 April 2015 08:51

□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□

রাজনীতিতে মূল ফরজটি হলো অসত্য ও অন্যায়ের নির্মূল এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। হারাম হলো যারা শরিয়তের প্রতিষ্ঠা বিরোধী এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিরোধী তাদের সমর্থণ করা ও তাদের ভোট দেয়া বা তাদের পক্ষে যুদ্ধ করা। কিন্তু রাজনীতির ফরজ পালন কি এতই সহজ? বিশ্ব তো অধিকৃত আল্লাহর শত্রুপক্ষের হাতে;এবং পরাজিত মহান আল্লাহতায়ালার কোরআনি বিধান ও তার সার্বভৌমত্ব। কোন একক ভাষা ও একক দেশের মুসলমানদের পক্ষে কি সম্ভব আল্লাহর দ্বীনের শত্রুদের পরাজিত করা? নানা ভাষা ও নানা বর্ণের শত্রুগণ তো গড়েছে আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন। ইরাক ও আফগানিস্তান দখলে রাখতে এ কোয়ালিশন পাঠিয়েছিল ৪০টি দেশের সেনাবাহিনী। মুসলমানগণ কি তাই ভাষার নামে,ভূগোলের নামে বা বর্ণের নামে বিভক্ত হতে পারে? বিভক্তি কোন কালেই বিজয়,গৌরব ও স্বাধীনতা আনে না। আনে পরাধীনতা। ইসলামে ভাষা বা বর্ণভিত্তিক বিভক্তির জাতিয়তাবাদি রাজনীতি তো কবিরা গুনাহ। অথচ এ কবিরা গুনাহর রাজনীতিই ১৯৭১ সালে বিজয়ী হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। আর সে বিজয় নিয়ে আজ উৎসবও হয়। ভাষাভিত্তিক রাজনীতি করে বাংলার মুসলমানদের পক্ষে কি একাকী সম্ভব ছিল ১৯৪৭য়ে স্বাধীনতা অর্জন? ভারতের বাঙালী,গুজরাটি,মারাঠি,বিহারি,পাঞ্জাবী, তামিল,কাশ্মিরী ও আসামী হিন্দুগণ ভাষার ভেদাভেদ ভূলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজও একতাবদ্ধ,তারা একতাবদ্ধ ছিল ১৯৪৭য়েও। অথচ রাজনীতির ময়দানে এরূপ একতাবদ্ধ হওয়াটি হিন্দুদের উপর ধর্মীয় ভাবে ফরজ নয়। কিন্তু অনিবার্য ফরজ হলো মুসলমানদের উপর। একাকী স্বাধীনতার পথ ধরতে গিয়ে কাশ্মিরের শেখ আব্দুল্লাহ যা অর্জন করেছে তা হলো ভারতের পদতলে অধীনতা। স্বাধীনতা ও সম্মান কি আছে বিশেরও বেশী টুকরায় বিভক্ত আরব মুসলমানদের? বাংলার মুসলমানদের ১৯৪৭য়ের সৌভাগ্যটি হলো,কাশ্মিরি নেতা শেখ আব্দুল্লাহর ন্যায় ভাষা বা প্রদেশের নামে তারা উপমহাদেশের অন্যভাষাভাষী মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। বরং তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছে। নইলে বাংলাদেশেও পরিণত হতো ভারতের পদতলে পিষ্ট আরেক কাশ্মিরে।

মুসলমান হওয়ার চ্যালেঞ্জটি তো বিশাল। মু’মিনের জীবনে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধটি তো অনিবার্য। শয়তান ও তার অধিপত্যবাদি কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে লড়াই এখানে প্রতিদিনের। যে মুসলমানের জীবনে সে যুদ্ধটি নাই,বুঝতে হবে তার ঈমান ও মুসলমান হওয়া নিয়েই বিশাল শূণ্যতা আছে। ইসলামের শত্রুপক্ষ কি চায়,নবীজী (সাঃ)র ইসলামের ন্যায় যে ইসলামে শরিয়ত আছে,জিহাদ আছে এবং খেলাফত আছে তা নিয়ে মুসলমানগণ বেড়ে উঠুক? তারা কি চায় বিশ্বের কোন এক ইঞ্চি ভূমিতেও শরিয়ত প্রতিষ্ঠা পাক? তারা তো বিশ্বকে একটি গ্লোবাল ভিলেজ রূপে দেখে। সে ভিলেজে মদ্যপায়ী,ব্যভিচারি,সমকামী,গো-পূজারি,মূর্তিপূজারি ও নাস্তিকদের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ছেড়ে দিতে তারা রাজী। কিন্তু নবীজী (সাঃ)র যুগের ইসলাম নিয়ে যারা বাঁচতে চায় তাদের জন্য কি সামান্যতম স্থানও ছেড়ে দেয়? বরং তাদের বিরুদ্ধে তো নির্মূলের ধ্বনি। সেটি শুধু বাংলাদেশে নয়,প্রতিদেশেই। মু’মিনের জীবনে সমগ্র বিশ্বটাই তাই রণাঙ্গন। এ রণাঙ্গণে একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার অবস্থানটি তাদের পক্ষে। যুদ্ধরত মু’মিনদেরকে তিনি গ্রহণ করেছেন নিজ বাহিনী তথা হিযবুল্লাহ রূপে। আর তার নিজ বাহিনীর লোকদের কি তিনি জাহান্নামের আগুণে ফেলতে পারেন? মু’মিনের জীবনে এর চেয়ে বড় অর্জন আর কি হতে পারে?

মহান আল্লাহতায়ালার কাছে অতিপ্রিয় হলো,যুদ্ধরত মুজাহিদগণ যুদ্ধ করবে সীসাঢালা প্রাচীরসম একতা নিয়ে। তাঁর নিজবাহিনীর মাঝে অনৈক্য তাঁর অতি অপছন্দের। পবিত্র কোরআনে সেটি ঘোষিত হয়েছে এভাবেঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করে এমন কাতারবদ্ধ ভাবে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।” –(সুরা সাফ,আয়াত ৪)। মুসলমানের জীবনে একতা তাই অনিবার্য কারণেই এসে যায়। সেটি যেমন সমাজ জীবনে,তেমনি দেশের রাজনীতি ও বিশ্বরাজনীতির মঞ্চে। যেখানে অনৈক্য, বুঝতে হবে সেখানে ঈমানে রোগ রয়েছে। অনৈক্যের অর্থই মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা। অথচ আজ সে অবাধ্যতাই মুসলিম বিশ্বে জোয়ারের জলের ন্যায় ছেয়ে আছে। মুসলিম জাহান আজ ৫৭ টুকরোয় বিভক্ত। ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের কিসের স্বাধীনতা থাকে? থাকে কি নিজ দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি,অর্থনীতি,আইন-আদালত ও প্রশাসনে আল্লাহতায়ালার প্রদর্শিত পথ মেনে চলার স্বাধীনতা? ইসলামের শত্রুপক্ষ তো চায় বিশ্বের প্রায় দেড় শত কোটি মুসলমান বেঁচে থাকুক ইসলামকে বাদ দিয়ে। এক্ষেত্রে তাদের সামনে উত্তম মডেল হলো বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশের ডি-ইসলামাইজড সেক্যুলারিস্টগণ। এ অবাধ্যদের জীবনে মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ নেই। নেই শরিয়তের প্রতি বিশ্বাস। নেই জিহাদ ও ইসলামের প্রতিষ্ঠায় সামান্যতম অঙ্গিকার। যা আছে তা হলো ইসলামের প্রচার ও প্রসার রোধে লাগাতর ষড়যন্ত্র। আছে দুর্বৃত্তি। আছে ইসলামপন্থিদের নির্মূলে সর্বাত্মক যুদ্ধ। কিন্তু এরপরও তাদের দাবী,তারা মুসলিম। আফগানিস্তান দখলের পর জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাবুলে দাঁড়িয়ে বলেন,“শরিয়তি আইনকে আফগানিস্তানে ফিরে আসতে দেয়া হবে না।” মুসলিম ভূমিতে দাঁড়িয়ে এ কথা বলার সাহস একজন কাফের পায় কোত্থেকে? আফগানিস্তানের আইন কীরূপ হবে সেটি কি জার্মান বা অন্য কোন কাফের দেশ থেকে অনুমতি নেয়ার বিষয়? ইসলামের শত্রুগণ কি আব্বাসীয়,উমাইয়া বা উসমানিয়া খেলাফতের আমলে এমন আস্ফালন উচ্চারণ করতে পেরেছিল? অথচ তখনও তো তারা সেটিই চাইতো। প্রশ্ন হলো,শরিয়ত ছাড়া কি ইসলাম পালন হয়? পবিত্র কোরআনের মহান আল্লাহতায়ালার ঘোষণা,“আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা বিচার করে না তারাই কাফের,..তারাই জালেম,..তারাই ফাসেক। -(সুরা মায়েদা,আয়াত ৪৪,৪৫,৪৭)।

[illegible]?

রাষ্ট্রের শক্তি ও সামর্থ বিশাল। এটিকে নিয়ন্ত্রনে না রাখলে পাগলা হাতির ন্যায় তছনছ করে দিতে পারে ধর্ম ও সভ্য জীবন-যাপনের সকল আয়োজন। আজকের বাংলাদেশে তো তারই উদাহরণ। দেশ অধিকৃত হয়েছে ভয়ংকর চোর-ডাকাতদের হাতে। ফলে বিপন্ন শুধু ইসলামই নয়, মানুষের জানমাল এবং ইজ্জত-আবরুও। আল্লাহর দ্বীন পালন কি শুধু মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়িয়ে চলে? সেটি সম্ভব হলে নবীজী (সাঃ)ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জীবনে কেন এত যুদ্ধ? কেনই বা তাদেরকে

রাষ্ট্রনায়কের আসনে বসতে হলো? নবীজী (সাঃ)র জীবনের বড় শিক্ষাঃ ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই রাষ্ট্রীয় শক্তির পূর্ণ ব্যবহার। চাই রাজনৈতিক ও সামরিক বল। ছোট্ট এক টুকরো ভূমির উপর কি বিশাল দুর্গ গড়া যায়? শ্রেষ্ঠ সভ্যতার নমুনা রূপে বিশ্বমাঝে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য তো চাই বিশাল মানচিত্র। চাই নানা ভাষা ও নানা বর্ণের মানুষের মাঝে গভীর একতা। নবীজী (সাঃ) তাই দ্রুত ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বাড়াতে মনযোগী হয়েছিলেন। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বাড়াতে তাঁকে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়তে হয়েছে। এবং মৃত্যুর আগে সাহাবাদের নসিহত করেছেন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল দখল করতে। এটি ছিল নবীজী (সাঃ)র স্ট্রাটেজিক ভিশন। মুসলমানদের জানমালের সবচেয়ে বড় কোরবানী হয়েছে তো মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি বাড়াতে। পরিপূর্ণ দ্বীন পালন, সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার নির্মাণ ও বিশ্বমাঝে সুমহান মর্যাদায় মাথা তুলে দাড়ানোর সামর্থ সৃষ্টি হয়েছে তো এভাবেই। আজও মুসলমানদের সামনে এটিই নবীজী (সাঃ)র মহান সুন্নত। অথচ আজ বেহাল অবস্থা। যে আসনে বসেছেন মহান নবীজী (সাঃ) ও তাঁর খলিফাগণ সে পবিত্র আসনে বসেছে চোরডাকাত ও কাফেরের শক্তির সেবাদাসেরা। খেলাফতের আওতাধীন সে বিশাল ভূগোল যেমন নাই,সে সামরিক বলও নাই। বিলুপ্ত হয়েছে মহান আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠার সামর্থ। মুসলমানদের পতনের শুরু তো তখন থেকে যখন আলেমগণ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও সংস্কারকে বাদ দিয়ে স্রেফ মসজিদ ও মাদ্রাসার চার দেয়ালের মাঝে নিজেদের কর্মকে সীমিত করেছে। পতনের মূল কারণ,সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিরূপে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে মহান নবীজী (সাঃ) যে সুন্নত রেখে যান সেটির প্রতি গুরুত্ব না দেয়া। শরিয়তের প্রতিষ্ঠায় জিহাদে অংশ নেয়া দূরে থাক,আলেমে-উলামা ও মুফতিগণ আজ জিহাদের কথা মুখে আনতে ভয় পান। না জানি সন্ত্রাসী রূপে চিহ্নিত হতে হয়। অথচ ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় কাফেরের শক্তির হাতে অধিকৃত হওয়ার পূর্বে শরিয়তই ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আইন।

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা,সংহতি ও ভূগোল বৃদ্ধি ইসলাম ধর্মে অতি পবিত্র ইবাদত। মুসলমান এ কাজে যেমন অর্থ দেয়,তেমনি প্রাণও দেয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তার ঘরের সমুদয় সম্পদ নবীজী (সাঃ)র সামনে এনে পেশ করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবাদের অবদানও ছিল বিশাল। মু'মিনের অর্থদান ও আত্মদানে মুসলিম ভূমিতে শুধু মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যাই বাড়ে না,সে সাথে বিলুপ্ত হয় দুর্বৃত্তদের শাসন এবং প্রতিষ্ঠা পায় মহান আল্লাহতায়ালার শরিয়তি বিধান পালনের উপযোগী পরিবেশ। যে দেশে জিহাদ নাই সে দেশে সেরূপ পরিবেশ গড়ে উঠে না। বরং ঘাড়ে চাপে চোর-ডাকাতগণ। বাংলাদেশে অবিকল সেটিই হয়েছে। মুসলমানদের গৌরব কালে মুসলমানদের জানমাল,শ্রম ও মেধার বেশীর ভাগ ব্যয় হয়েছে জিহাদে,ফলে নির্মিত হয়েছে সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা। কে মু'মিন আর কে মুনাফিক -সেটিও কোন কালে মসজিদের জায়নামাজে ধরা পড়েনি। ধরা পড়েছে জিহাদে। ওহুদের যুদ্ধের সময় নবীজী (সাঃ)র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার। কিন্তু তাদের মধ্যে ৩০০ জন তথা শতকরা ৩০ ভাগই ছিল মুনাফিক যারা নবীজী (সাঃ)র জিহাদী কাফেলা থেকে সটকে পড়ে। তারা যে শুধু নিজেদের মুসলমান রূপে দাবী করতো তা নয়,মহান নবীজী (সাঃ)র পিছনে দিনের পর দিন নামাযও পড়েছে। জিহাদ এভাবেই সাচ্চা মু'মিনদের বাছাইয়ে ফিল্টারের কাজ করে। মুখোশ খুলে যাবে এ ভয়ে মুনাফিকগণ তাই ফিল্টারের মধ্য দিয়ে যেতে ভয় পায়। এদের পক্ষ থেকে জিহাদের বিরুদ্ধে এজন্যই এত প্রচারণা। তারা তো চায়,মুসলিম সমাজদেহে লুকিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়তে।

মুসলমানগণ জনসংখ্যায় আজ বিশাল। কিন্তু কোথায় সে সামরিক ও রাজনৈতিক বল? কোথায় সে ইজ্জত? শক্তি ও ইজ্জত তো বাড়ে অর্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে। ১৫০ কোটি মুসলমানের জীবনে যদি সেরূপ বিনিয়োগ না থাকে তবে কি শক্তি ও ইজ্জত থাকে? রাজনৈতিক বল বাড়াতে যেমন চাই আত্মত্যাগী বিশাল জনবল,তেমনি চাই বিশাল ভূগোল। বিশাল

Written by ফরিদে মাহবুব কামাল
Sunday, 05 April 2015 09:32 - Last Updated Monday, 06 April 2015 08:51

ভ্গোলেরে কারণেই ভারতরে সামরকি ও রাজনতৈকি শক্তি আজ বশিাল। অথচ ভারতে বাস করে বশি্বরে সর্বাধকি দরদি্র মানুষ। ক্ষুদ্র কাতার-কুয়তে-দুবাই কমিাথাপছি্ আয় ভারতরে চয়ে ৫০ গুণ বাড়য়িওে সরেূপ সামরকি ও রাজনতৈকি বল পাবে? মুসলমি উম্মাহর সামরকি ও রাজনতৈকি বল বাড়াতইে ইখতয়িার মুহম্মদ বনি বখতয়িার খলিজরি ন্যায় মহান তুর্কি বীর বাংলার বুকে ছুটে এসছেলিনে। তমেনি এক মহান লক্ষ্যকে সামনে নয়িে উপমহাদশেরে মুসলমানগণ নানা ভাষা, নানা প্রদশে ও নানা বর্ণরে ভদোভদে ভুলে বশি্বরে সর্ববৃহৎ মুসলমি রাষ্ট্র পাকসি্তানরে জন্ম দয়ে। সটোই ছলি সাতচল্লশিরে লগি্যাসি। এর মূলে ছলি প্যান-ইসলামকি চতেনা। কনি্তু ইসলামরে শত্রুপক্ষরে কাছে পাকসি্তানরে জন্ম শুরু থকেইে পছন্দ হয়নি। হনি্দু,খৃষ্টান, ইহুদী,নাস্তকি,বামপন্থি এরা কউেই পাকসি্তানরে প্রতষি্ঠাকে মনে নতিে পারনি। কারণ ইসলাম ও মুসলমানরে শক্তি ও গৌরববৃদ্ধতিে তারা কউেই খুশি নয়, বরং সটেকিে হুমকমিনে কর। ফল দশেটরি বরিুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয় ১৯৪৭ থকেইে। সে ষড়যন্ত্ররে সাথে নজিকেে জড়তি করনে শখে মুজবিও। তাই ষড়যন্ত্ররে রাজনীতইি ছলি তার রাজনীত। পাকসি্তানরে জলে থকেে ফরোর পর সহরোয়ার্দী উদ্যানরে প্রথম সভায় শখে মুজবি সে ষড়যন্ত্ররে কথাটি ব্যক্ত করতে দ্বধিা করনেন। (এ নবিন্ধরে লখেক সে বক্তৃতাটি নজি কানে শুনছেনে।)মুজবিে বক্তৃতার ভাষাটি ছলি এরূপঃ “বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামরে শুরু একাত্তর থকেে নয়,উনশি শ’ সাতচল্লশি থকেইে”। ১৯৪৭য়ে শুরু করা সে ষড়যন্ত্রটি সফিল হয় ১৯৭১য়। তখন ভারতীয় বাহনীর পদতলে মৃত্যু ঘটে তৎকালীন বশি্বরে সর্ববৃহৎ মুসলমি রাষ্ট্র পাকসি্তানরে। অথচ পাকসি্তানরে সৃষ্টতিে বাংলার মুসলমানদরে ভূমকিা ছলি উপমহাদশেরে আর যে কোন ভাষার মুসলমানদরে চয়ে অধীক। তারাই ছলি দশেটরি সংখ্যাগরষি্ঠ নাগরকি। বশিাল স্বর্ণখন্ডকে যে ব্যক্তি মামুলী পাথর মনে করে তারা কাছে সে স্বর্ণখন্ডটি হারয়িে যাওয়ায় দুঃখ জাগে না। তার জীবনে জীর্ণকুঠরিরে বাসও তাই শষে হয়না। তমেনি এক গভীর অজ্ঞতার কারণে বশিাল খলোফত ভূমভিঙেগে যাওয়াতে মুসলমানদরে জীবনে দুঃখ জাগনে। দুঃখবোধ হয়নি পিলাশীর প্রান্তরে বাংলা-বহিার-উড়ষি্যার স্বাধীনতা অস্ত যাওয়াতওে। বরং ইংরজে বাহনীর বজিয় উৎসব দখেতে হাজার হাজার মানুষ রাজধানী মুর্শদিাবাদরে সড়করে দু’পাশে ভড়ি জময়িছে। সে অসুস্থ্য চতেনার কারণে বাংলার বুকে ব্রটিশি শাসকদরে বরিুদ্ধে বড় রকমরে জহিাদও হয়নি। বাঙালী মুসলমানদরে জীবনে একই রূপ অজ্ঞতা পুণরায় দখো দয়ে ১৯৭১য়ে। ফলে কাফরেদরে বজিয় উৎসবও তাদরে নজিদেরে উৎসবে পরণিত হয়ছে। ঢাকার রাস্তায় ভারতীয় সনোদরে অনুপ্রবশেে লক্ষ লক্ষ মানুষ সদেনি দুপাশে দাঁড়য়িে প্রচন্ড বজিয়-উল্লাস করছে। ১৯৭০য়ে নরি্বাচনে শখে মুজবিরে বশিাল সাফল্যরে বড় কারণ,ভারতরে সাথে ষড়যন্ত্ররে সে গোপন বষিয়টি তনিি গোপন রাখতে সমর্থ হয়ছেনে। জনগণ জানলে কি তার মত ভারতীয় চর ও ষড়যন্ত্রকারকিে ১৯৭০য়রে নরি্বাচনে ভোট দতি? বাংলার মুসলমানদরে বড় ব্যর্থতা,তারা একাত্তরে ইসলামরে মূল শত্রুদরে চনিতে ভয়ানক ভাবে ব্যর্থ হয়ছে। ঘুমরে ঘোরে বষিাক্ত গোখরা শাপকে গলায় পেঁচয়িে নয়োর বপিদ তো ভয়াবহ। একাত্তরে সটেইি ঘটছে। সে ভূলরে পরনিাম হলো,আজ শুধু পদ্মা,তসি্তা,সুরমার পানি নয়,বাংলাদশেরে স্বাধীনতা অস্তত্বিওে আজ টান পড়ছে। বাংলাদশেে আজ যে যুদ্ধাবস্থা তা তো একাত্তররে যুদ্ধরেই ধারাবাহকিতা।

□□□□□(□□□)□ □□□□□□□□□

লিগ্যাসি ইংরেজী শব্দ। বিখ্যাত ব্যক্তিদের অবদান তাদের মৃত্যুর পরও বহুকাল বেঁচে থাকে। তেমনি বেঁচে থাকে বিশাল কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সুফল বা কুফলগুলোও। ইতিহাসে এভাবে যা বেঁচে থাকে তাকেই বলা হয় লিগ্যাসি। মানব ইতিহাসে ইসলাম ও তার সর্বশেষ নবী মুহম্মদ (সাঃ)র লিগ্যাসিটি বিশাল। সেটি মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ গড়ার ও সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা নির্মানের। তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ ইতিহাস গড়েন মহান আল্লাহতায়ালার প্রতিটি হুকুম পালনে। নবীজী (সাঃ)র লিগ্যাসি হলো নানা বর্ণ,নানা ভাষা ও নানা ভূ-খন্ডের মানুষের মাঝে গভীর ভাতৃত্ব গড়ার। শুধু ধর্মীয় বলেই নয়,রাজনৈতিক ও সামরিক বলেও তিনি মুসলমানদের শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দিয়ে যান। তাই মুর্তিপূজা,নাস্তিকতা ও নানারূপ পাপাচার থেকে মুক্তিদানই নবীজী (সাঃ)র একমাত্র সাফল্য নয়,মুক্তি দিয়েছেন ভাষাপূজা,বর্ণপূজা,গোত্রপূজা ও জাতিপূজা থেকেও। অথচ সেগুলোই ছিল আরবের বুকে বহু শত বছর যাবৎ রক্তাক্ষয়ীর যুদ্ধের মূল কারণ। এভাবে নবীজী (সাঃ) মুক্তি দিয়েছেন বিশাল আকারের প্রাণহানি ও সম্পদহানি থেকেও। ফলে পারস্যের সালমান ফারসী (রাঃ),আফ্রিকার বেলাল(রাঃ),রোমের সোহায়েব (রাঃ)এর সাথে আরবের আবু বকর (রাঃ),উমর(রাঃ)বা আলী (রাঃ)র কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে কাজে কোনরূপ সমস্যা দেখা দেয়নি। সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে একমাত্র সে সময়টিই ছিল সবচেয়ে গৌরবের। একমাত্র তখনই বড় বড় বিজয় এসেছে এবং নির্মিত হয়েছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। ঈমানের দায়বদ্ধতা হলো নবীজী (সাঃ)র সে শিক্ষা ও লিগ্যাসি নিয়ে বাঁচা।

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□

মানব সমাজে শয়তানও বেঁচে আছে তার লিগ্যাসি নিয়ে। শয়তানের লিগ্যাসিটি হলো মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা। বাংলাদেশে যারা একাত্তরের চেতনার ধারক তাদের রাজনীতি,সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহটি প্রকট। তাদের জীবনে শয়তানে সুন্নত (সুন্নত শব্দের অর্থ ট্রাডিশন)। ফলে ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে নির্মূলের সুর তাদের রাজনীতিতে। তাদের কাছে ইসলামের সংস্কৃতি,খেলাফত ও শরিয়ত চিত্রিত হয় মধ্যযুগীয় বর্বরতা রূপে। শয়তান শুধু মুর্তিপূজায় ডাকে না। ডাকে গোত্রপূজা,বর্ণপূজা,শ্রেণীপূজা,ভাষাপূজা,দলপূজা,দেশপূজা ও জাতিপূজার দিকেও। এরূপ ডাকার কাজে শয়তানের যেমন নিজস্ব পুরোহিত বাহিনী আছে,তেমনি বিপুল সংখ্যক পূজামন্ডপও আছে। আছে বিশাল প্রশাসনিক অবকাঠামোও। তারাও ডাকে ভাষাপূজা ও ভাষাভিত্তিক জাতি-পূজা’র দিকে। তথাকথিত শহীদ মিনারের নামে ভাষাপূজার বেদীমূলগুলো গড়া হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে। মন্দিরে হাজিরা দেয়ার ন্যায় পূজার এ মন্ডপগুলিতেও নগ্নপদে হাজির হতে হয়। নবীজী (সাঃ)র যুগে আরব জাহেলদের মাঝে যে শুধু মুর্তিপূজা ছিল –তা নয়। ছিল গোত্রপূজা,বর্ণপূজা ও জাতিপূজার পুরনো ঐতিহ্যও। তাদের রাজনীতিতেও ছিল ঈমানদারদের বিরুদ্ধে নির্মূলের সুর। জাহেলী যুগে গোত্র বা বর্ণের নামে যুদ্ধ একবার শুরু হলে সেটি আর থামতো না। পূর্বপুরুষদের শুরু করা যুদ্ধগুলিকে তাদের সন্তানেরাও বছরের পর বছর চালিয়ে

Written by ফরিদ মাহবুব কামাল
Sunday, 05 April 2015 09:32 - Last Updated Monday, 06 April 2015 08:51

যেতে। বাংলাদেশের ইসলামবিরোধীগণও বেঁচে আছে শয়তানের সে লিগ্যাসি নিয়ে। ফলে তাদের রাজনীতিতে এখনো বেঁচে আছে ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে নির্মূলের যুদ্ধ।

একাত্তরের লিগ্যাসি হলো উম্মাহর বিভক্তি ও মুসলিম শক্তিকে ক্ষুদ্রতর করার। তাই একাত্তরে ভারতের যুদ্ধজয়ে শুধু পাকিস্তান দুর্বল হয়নি। দুর্বল হয়েছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ। দুর্বল হয়েছে বাংলাদেশের মুসলমানগণও। সে সাথে প্রচন্ড আশাহত হয়েছে ভারতের মুসলমানগণ। একাত্তরের পর দারুন ভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের মুসলমানদের মুসলমান রূপে বেড়ে উঠার কাজটি। এবং বেগবান হয়েছে মুসলিম সন্তানদের ইসলাম থেকে দূরে সরানোর কাজ। একাজে দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে হাতিয়ার রূপে। রাজনীতিতে ইসলামের শত্রুপক্ষ এতটাই প্রবল যে,ইসলামপন্থিদের জন্য সামান্য স্থান ছেড়ে দিতেও তারা রাজি নয়। আগ্রাসনের শিকার হয়েছে বাংলার মুসলিম সংস্কৃতি। এবং মুসলমান বিচ্যুৎ হচ্ছে জীবনের মূল মিশন থেকে। তবে ইসলামের শত্রুপক্ষের মূল স্ট্রাটেজীটি স্রেফ মুসলিম সন্তানদের ইসলাম থেকে দূরে সরানো নয়,বরং মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করা এবং সে ক্ষুদ্র মানচিত্রকে যুগ যুগ বাঁচিয়ে রাখা। মুসলিম উম্মাহকে শক্তিহীন রাখার এটাই শয়তানি স্ট্রাটেজী। সে স্ট্রাটেজীর অংশ রূপেই অখন্ড আরব ভূমিকে বিশেরও বেশী টুকরোয় বিভক্ত করা হয়েছে। তাই একাত্তরে পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজটি শেখ মুজিবের একার ছিল না। প্রকল্পটি একক ভাবে শুধু ভারতেরও ছিল না। ভারতকে যে শুধু ইসরাইল অস্ত্র জুগিয়েছে তাও নয়। বরং এ প্রকল্পটি হাতে নিয়েছিল ইসলামের শত্রুপক্ষের আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন;এবং সেটি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। পাকিস্তানের মূল অপরাধটি এ ছিল না যে,দেশটিতে স্বৈরাচার বা বৈষম্য ছিল। বরং বর্বরতম স্বৈরাচারের শিকার তো আজকের বাংলাদেশ এবং বেশী বৈষম্য তো ভারতে।

□□□□ □□□□□□□□□ □□□

ইসলামে অতিশয় ছওয়াবের কাজ হলো সৃষ্টিশীলতা। মুসলমানের গৌরব তাই গড়াতে,ভাঙ্গাতে নয়। ইসলামে অতি নিন্দনীয় হারাম কাজ হলো কোন কিছু ভাঙ্গা। অকারণে গাছের একটি ডাল ভাঙ্গাও হারাম। তেমনি অতিশয় হারাম কর্ম হলো মুসলিম দেশের ভূগোল ভাঙ্গা। এজন্যই তো মুসলিম দেশ ভাঙ্গা নিয়ে শয়তানের অনুসারিদের এত উৎসব। তাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গড়াটি সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জুড়ে যতটা প্রশংসা কুড়িয়েছে, ১৯৭১য়ে পাকিস্তান ভাঙ্গাটি সে প্রশংসা পায়নি। অনেকে বরং চোখের পানিও ফেলেছে। (লেখক সে বর্ণনা শুনেছেন ভারত ও আফ্রিকার মুসলিমদের থেকে।) মুসলিম দেশ ভাঙ্গার এ কর্মটি বরং আনন্দের প্রচন্ড হিল্লোল তুলেছে ভারতের ন্যায় কাফের দেশগুলোতে। কলকাতার রাস্তায় সেদিন মিষ্টি বিতরণ হয়েছে। এবং কাফের দেশগুলিই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ রূপে ত্বরিৎ স্বীকৃতি দিয়েছে,কোন মুসলিম দেশ নয়। মুসলিম দেশের ভাঙ্গন রোধে সীমান্তের এক মুহুর্তের পাহারাদারিকে নবীজী (সাঃ) সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এমন একটি চেতনা কারণে সময়ের তালে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলেও মুসলিম দেশের ভূগোলে ভাঙ্গন আসেনি। অথচ ভাষা,বর্ণ ও আঞ্চলিকতার নামে বহু দেশে বিভক্ত হয়েছে ইউরোপ। দেশগুলি বছরের পর বছর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও লিপ্ত থেকেছে। এর বিপরীত,মুসলমানদের ইতিহাস হলো বিভক্তির দেয়াল ভাঙ্গার। দেয়াল ভাঙ্গার মধ্য দিয়েই আরব,ইরানী,তুর্কি,কুর্দি,মুর,বার্বার ও অন্যান্য ভাষার মুসলমানগণ ইউরোপের চেয়ে কয়েকগুণ বৃহৎ ভূখন্ড জুড়ে অভিন্ন উম্মাহ ও এক বিশাল রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে।

ভ্রাতৃত্ব,সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও একতা মুসলিম উম্মাহর জীবনে একাকী আসে না,সাথে আনে মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত সাহায্যও। যুদ্ধের ময়দানে তাদের সাহায্যে এমন কি বিপুল সংখ্যায় ফেরেশতাগণও নেমে আসেন। সে সাহায্যের বরকতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়েছে বিশাল বিশাল শত্রু বাহিনীর উপর। পরাজিত করছে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের ন্যায় দুই বিশ্বশক্তিকে। অনৈক্যে বিজয় জুটে না,দেশও বাঁচে না। অনৈক্যে যা জুটে তা হলো অপমানকর পরাজয় ও গোলামী। এবং আনে মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে কঠিন আযাব। সে আযাবের অংশ রূপেই লক্ষ লক্ষ মুসলমান গণহত্যার শিকার হয়। শহরের পর শহর তখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। এবং দেশ অধিকৃত হয় শত্রু বাহিনীর হাতে। সেটি যেমন হালাকু-চেঙ্গিজের হাতে ঘটেছে,তেমনি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদিদের হাতেও ঘটেছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ভিন্ন ভাষা,ভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন জাতীয়তার নামে মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও বিভক্তিটা স্থায়ী করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সীমানার নামে দেয়াল খাড়া করা কি ঈমানদারী? নিজ গৃহে ভাইয়ের প্রবেশে রুখতে কি দেয়াল গড়া যায়? ইসরাইল বা ভারতের ন্যায় শত্রু দেশে এমন দেয়াল গড়তে পারে। কিন্তু সে দেয়াল মুসলমান দেশে গড়ে কি করে? খেলাফতের যুগে সেরূপ দেয়াল ছিল না। ফলে সে বিশাল মুসলিম খেলাফতের যে কোন প্রান্ত থেকে মক্কা-মদিনা বা অন্য কোন শহরে পৌঁছতে ভিসার প্রয়োজন পড়তো না। মুসাফিরের মুসলমান পরিচিতিটাই সে জন্য যথেষ্ট ছিল।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষার নামে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সেগুলীর নামে বিভক্তির সীমান্তরেখাগুলি হলো মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষতিকর বিদ'য়াত। এটি প্রাচীন জাহিলিয়াত। আত্মবিনাশী এ বিদ'য়াতকে বাঁচাতে গড়া হয়েছে শত শত কোটি ডলার ব্যয়ে বিশাল বিশাল সামরিক বাহিনী। শুরু হয়েছে ভিসার প্রচলন। তার আলেমদের অপরাধ হলো,ছোটখাটো বিদ'য়াত নিয়ে উচ্চকন্ঠ হলেও এরূপ বিধ্বংসী বিদ'য়াত নিয়ে তাদের মুখে কোন কথা নেই। ঈমানের রোগ নির্ণয়ে মাপকাঠি অনেক। তবে রোগটি নির্ভুল ভাবে ধরা পড়ে অন্য ভাষা,অন্য দেশে ও অন্য বর্ণের মুসলমানকে নিজ ভাই রূপে আলিঙ্গণের অসামর্থতায়। কারণ,সেজন্য তো চাই ঈমানে পর্যাপ্ত বল। চাই বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদের উর্দ্ধে উঠার সামর্থ। বাঙালী মুসলমানদের ঈমানের সে অসামর্থতা ধরা পড়েছে একাত্তরে। স্রেফ ভাষা,বর্ণ ও জন্মস্থান ভিন্ন হওয়ার কারণে একাত্তরে হাজার হাজার বিহারীকে বাংলার বুকে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষিতা হয়েছে তাদের নারীরা। জীবিতদেরকে রাস্তায় নামিয়ে তাদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা-বাণিজ্যকেও দখলে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে বিহারী বস্তিগুলো সে অপরাধের সাক্ষিরূপে এখনো বেঁচে আছে। এরূপ রোগ নিয়ে ইউরোপীয়রা বিশ্বের নানা দেশে বর্ণ ও জাতিগত নির্মূলে নেমেছে। নির্মূলের পর সেখানে নিজেদের কলোনি গড়েছে। আর বাংলাদেশের বুকে বহু দুর্বৃত্ত বাঙালী নেমেছে বিহারী মহল্লায়। বাংলাদেশের সরকার এসব দুর্বৃত্তদের পুরস্কৃত করছে তাদের দখলকৃত ঘরবাড়ি ও দোকানপাঠের উপর মালকিনার সনদ দিয়ে।

বড় লক্ষাধিক নবীরাসূল একসাথে প্রেরিত হলেও তাদের মাঝে কি কোন বিরোধ হতো? তাদের মাঝে কি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ও সেসব রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার নামে সীমানা গড়া হতো? এক্ষেত্রে আজকের মুসলমানদের ব্যর্থতাটি বিশাল। শুধু নামায-রোযার মধ্য দিয়ে কি এ ব্যর্থতার আযাব এড়ানো যায়? এরূপ ব্যর্থতা নিয়ে কি মহান আল্লাহতায়ালার কাছে প্রিয় বান্দা হওয়া যায়? অনৈক্য ও বিভক্তি যে কতটা সর্বনাশা -সেটি বুঝতে কি ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন পড়ে? প্রমাণ তো মুসলমানগণ নিজেরাই। বিশ্বে তাদের সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে মুসলিম রাষ্ট্রও। কিন্তু তাতে কি তাদের শক্তি,সামর্থ ও প্রতিরক্ষা বেড়েছে? বেড়েছে কি স্বাধীনতা ও মান-ইজ্জত? সংখ্যায় প্রায় দেড় শত কোটি হওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদসহ বিশ্বের কোন প্রতিষ্ঠানেই কি তারা সাড়ে ৫ কোটি বৃটিশ বা ৬ কোটি ফরাসীদের সামনে কি সমান

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 05 April 2015 09:32 - Last Updated Monday, 06 April 2015 08:51

অধীকার নিয়ে দাঁড়াতে পারে?

□□□□□□□ □□□□

এরূপ বিপর্যয় ও অপমান থেকে বাঁচাতেই মহান আল্লাহতায়ালা শুধু চুরি-ডাকাতি,মদ-জুয়া,ব্যভিচার ও মিথ্যাচারকে হারাম করেননি,হারাম করেছেন ভাষা,বর্ণ,গায়ের রং,আঞ্চলিকতা নিয়ে মুসলিম ভূগোলকে বিভক্ত করার রাজনীতি। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালার হুশিয়ারি,“সবাই মিলে তোমরা আঁকড়ে ধরো আল্লাহর রশিকে,এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না।” –(সুরা আল ইমরান আয়াত ১০৩)। এভাবে তিনি কঠোর ভাবে সাবধান করেছেন অনৈক্য থেকে বাঁচতে। আরো হুশিয়ার করেছেন এ বলে,“তোমরা তাদের মত হয়ো না,যারা সুস্পষ্ট নির্দেশ আসার পরও বিভক্ত হয়,এবং ভেদাভেদ গড়ে। এদের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে বিশাল আযাব।” –(সুরা আল ইমরান আয়াত ১০৫)। উপরুক্ত প্রথম আয়াতটিতে পবিত্র কোরআন চিহ্নিত হয়েছে আল্লাহর রশি রূপে। মুসলমানদের উপর ফরজ হলো,জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহর এ রশিকে আঁকড়ে ধরা ও বিভক্তি থেকে বাঁচা। দ্বিতীয় আয়াতটিতে সুস্পষ্ট হুশিয়ারি হলো,আল্লাহতায়ালার আযাব নামিয়ে আনার জন্য মুর্তিপুজারি বা নাস্তিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। সে জন্য মহান আল্লাহতায়ালার রশিকে পরিত্যাগ করা ও নিজেদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টিই যথেষ্ট। বিভক্তির চুড়ান্ত রূপটি হলো বিভক্ত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রগুলির নামে গড়ে উঠা দেয়াল। বিগত বহু শত বছর যাবত মুসলিম চেতনায় মহান আল্লাহতায়ালার এ হুশিয়ারিটি মুসলমানদের মাঝে এতটাই প্রকট ভাবে বেঁচেছিল যে মুসলিম জনগণ কখনোই মুসলিম ভূখন্ডকে বিভক্ত করার কাজে অংশ নেয়নি। ভাষা, বর্ণ,আঞ্চলের নামে দেশও গড়া হয়নি। এমন কি ১৯৭১য়েও কোন ইসলামি দলগুলির কোন নেতাকর্মী,কোন আলেম বা কোন পীর-মাশায়েখ পাকিস্তান ভাঙ্গাকে সমর্থণ করেনি। সে লক্ষ্যে তারা ভারতে যায়নি এবং অস্ত্রও ধরেনি।

বাংলাদেশের মুসলমানগণ আজ ভয়ানক আযাবের গ্রাসে। দেশে আজ যুদ্ধাবস্থা। তবে এ আযাব তাদের স্বহাতে অর্জিত। যে পাপের কারণে এ আযাব তাদেরকে ঘিরে ধরেছে সেটির শুরু আজ নয়,বরং একাত্তর থেকেই। একাত্তরে যাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাদের কাছে মহান রাব্বুল আলামীনের উপরুক্ত হুশিয়ারিটি আদৌ গুরুত্ব পায়নি। তাদের হাতে আল্লাহর রশিটি যেমন ছিল না,তেমনি ছিল না মুসলিম উম্মাহর একতা,সংহতি ও কল্যাণের ভাবনা। তারা তো ধরেছে ভারতের রশি। ভারতের রশির টানেই তারা দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছে। সে রশি দিয়েই শেখ মুজিব ও তার অনুসারিগণ বাংলাদেশকে ভারতের দাসত্বের জালে আবদ্ধ করে। বাঙালী মুসলমানের স্বাধীনতার কথা তাদের কাছে একটুও গুরুত্ব পায়নি। গুরুত্ব পায়নি মুসলিম উম্মাহর ইজ্জত-আবরুর কথাও। সেটি গুরুত্ব পেলে কি মুজিব ভারতের সাথে ২৫ সালা দাসচুক্তি স্বাক্ষর করতো। ভারতীয় কাফেরদের অস্ত্র কাঁধে নিয়ে মুজিবের অনুসারিরা ভারতের সাম্রাজ্যবাদি আধিপত্যকে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ভারতীয়দের চেয়েও এসব আওয়ামী বাকশালীগণ যে বেশী ভারতীয় সেটির প্রমাণ তো তারা এভাবেই দিয়েছে। ভারত এজন্যই বাংলাদেশের বুকে তাদের এ বিশ্বস্থ্য দাসদের চিরকাল ক্ষমতায় রাখতে চায়।এবং নির্মূল করতে চায় তাদের যারা ভারতের অধীনতা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে চায়। ফলে বর্তমান অবৈধ সরকারের ভোট-ডাকাতি যত কদর্য কর্ম রূপেই হোক,ভারত সেটিকে শতভাগ বৈধতা দেয়। ক্ষমতা থেকে উৎখাত হলে এ দাসগণ যে ইতিহাসের আবর্জণায় যাবে তা নিয়ে কি ভারতীয়দের মনেও কোন সন্দেহ আছে? আধিপত্যবাদি দেশ তো অন্যদেশের

অভ্যন্তরে এমন দাসদেরই খোঁজে। ভারতের কাছে মুজিব ও তার বাকশালী সহচরদের কদর তো এজন্যই এত অধিক। স্বাধীনচেতা মানুষদের তারা বরং শত্রু জ্ঞান করে। ফলে বাংলাদেশে বুকে তাদের বিরুদ্ধে নির্মূলের এতো আয়োজন। শুধু র'য়ের এজেন্ট, র‍্যাব,পুলিশ,বিজিবি ও দলীয় গুন্ডাবাহিনীই শুধু নয়,আদালতের বিচারকদেরও এ নির্মূল কাজে ময়দানে নামানো হয়েছে। পদসেবী এ দাসদের ক্ষমতায় রাখতে ভারত বরং একাত্তরের ন্যায় আরেকটি যুদ্ধ করে দিতেও রাজী। সাম্রাজ্যবাদিদের সেটিই তো চিরাচরিত রীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দাসদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে সেরূপ যুদ্ধ বিশ্বের নানা দেশে লড়ছে। ভারত সেরূপ যুদ্ধ বাংলাদেশে লড়বে তাতেই বা বিস্ময়ের কি? এ সহজ বিষয়টুকু বুঝার জন্য কি পন্ডিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে? ০৪/০৪/২০১৫